সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ● আগস্ট ২০১৬ ● দুই টাকা

স্বাধীনতার পরে যত সরকার ক্ষমতায় এসেছে
সকলেই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে

গত ১ জুলাই গুলশানের 'হলি আর্টিজান' রেস্টুরেন্টে আইএস নামধারী ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে বিদেশিসহ ২২জন মানুষের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশবাসীর সাথে আমরাও গভীরভাবে বেদনাহত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। এর এক সপ্তাহের মাথায় ৭ জুলাই ঈদের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের বৃহত্তম ঈদ জামাতকে লক্ষ্য করে সংলগ্ন এলাকায় পরিচালিত সন্ত্রাসী আক্রমণে ৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এই হামলাগুলো মানুষের মনে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে লক্ষ্য করছে যে, এই ধর্মান্ধ উগ্রবাদী শক্তির হাত থেকে এমনকি ধর্মপ্রাণ মানুষও নিরাপদ নয়।

কিন্তু এ কথাটিও ঠিক যে ঘটনাগুলো ঘটছে। কেন ঘটছে তা নিয়ে আলোচনাও কম হচ্ছে না। মানুষ এ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজছেন। তবে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া এই উগ্রতা ও নৃশংসতার উৎস কী- তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে না পারলে মানুষের মধ্যে এই শঙ্কা ও আতঙ্ক বাড়তেই থাকবে। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা কোন্ অভাবের কারণে এমন আত্মঘাতী হয়ে উঠছে, কেনই বা একটা বিরাট সংখ্যক ছেলেরা ক্যারিয়ার ত্যাগ করে হত্যাকারী হয়ে উঠছে- এর কারণ সঠিকভাবে একেবারে নির্দিষ্ট করে ধরতে না পারলে এই ভয়, আতঙ্ক, অসহায় অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে না। তাই বলে কারণ বের করার প্রচেষ্টা থেমে নেই। যেহেতু মানুষ এই সমস্যার ভুক্তভোগী- সেহেতু এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছেই। মানুষ বুঝতে চাইছেন, পথ খুঁজে পেতে চাইছেন।

এরকম পরিস্থিতিতে দেশের ক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দলসমূহ বসে থাকে না। তারা ঘটনাটিকে কাজে লাগায়, এর ত্রাস এবং আতঙ্কের দিকটিকে নিজেদের ক্ষমতা হস্তগত করার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। জনগণের বেশির ভাগই তাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও ক্ষমতার বাইরে থাকা- এই দুটো অংশের কোনো একটির চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত হন, যেহেতু তারাই প্রচার মাধ্যমগুলোতে বেশি থাকে। ফলে সত্য আবিষ্কার করা জনগণের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে না। আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে, যেখানে দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার উপক্রম- এরূপ অবস্থায় আমরা মনে করি দেশের মানুষ ঘটনাসমূহকে বিচারের ক্ষেত্রে বিগ বিজনেস হাউসগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা মিডিয়াগুলোর উপর নির্ভর না করে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আলোকে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করবেন।

ইসলামপন্থী উগ্র জঙ্গীদের সাম্রাজ্যবাদীরাই সৃষ্টি করেছিলো

সোভিয়েতপন্থী নজিবুল্লাহ্ সরকারকে উৎখাত করার জন্য আমেরিকা তালেবানদের সৃষ্টি করেছিলো। প্রায় ৯০ হাজার তালেবান অর্থাৎ মাদ্রাসার ছাত্রদের আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে কিভাবে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো থেকেও কিভাবে জিহাদিদের সংগ্রহ করা হয়েছে তা এখন এক রোমাঞ্চকর গল্পের মতো শোনাবে। সিআইএ 'অপারেশন সাইক্লোন' নামে যে প্রজেক্ট পরিচালনা করে তাতে তারা শত শত কোটি টাকা সেদিন তালেবানদের পেছনে ঢেলেছিল। সেদিনও বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মভীরু ছাত্র-যুবকরা ধর্ম রক্ষার সংগ্রাম মনে করেই আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখলের এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলো, প্রাণও দিয়েছিলো। আজ তাদের পরিবারের কেউ হয়তো ইন্টারনেট টিপলেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের সাথে তালেবান নেতাদের বৈঠকের ছবি দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন।

১৯৯৬ সালে তালেবানরা ক্ষমতায় এলো। তাদের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এই উগ্র মৌলবাদী রাজনীতি কোনো একটি দেশের ক্ষমতা দখল করলো। আফগান যুদ্ধের সময়ই গড়ে উঠেছিলো ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে 'আল কায়েদা'। বিভিন্ন ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠন গড়ে ওঠা ও তাদের একত্রিত হওয়ার জায়গা ছিলো এই আফগান যুদ্ধ। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের পরই আমেরিকার সেই সময়ের কাজ শেষ হয়। কিন্তু এই গ্রুপগুলো তখন সশস্ত্র ও শক্তিশালী।

তাদের ঘাঁটি আছে, অস্ত্র আছে, ট্রেইনড ক্যাডার আছে। অস্ত্রের ধর্মই এই যে, এটি যার হাতে যখনই যায়, সেই তখন একটি স্বতন্ত্র শক্তি ধারণ করে এবং এক সময় সে তার স্রষ্টার বিরুদ্ধেই অস্ত্র তাক করে। এক্ষেত্রে তাই হলো। ১৯৯৮ সালে আল কায়েদা কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে বোমা হামলা চালায়। সারা বিশ্বেই তখন এরকম ঘটনা একের পর এক চলতে থাকে। চলতে চলতে একসময় ৯/১১ এর টুইন টাওয়ার কাণ্ড ঘটে। আমেরিকা তখন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের শ্লোগান তুলে। আক্রমণ শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্যে।

জঙ্গীবাদকে সামনে রেখেই সাম্রাজ্যবাদ আজ আংশিক ও স্থানীয় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে

টুইন টাওয়ারের ঘটনা নিয়েও অনেক কথা আছে। আমেরিকার মতো দেশে এরকম ঘটনা নিরব সমর্থন ছাড়া যে ঘটতে পারেনা- এটা অনেকেরই ধারণা। এই বিতর্কে আমরা যদি নাও যাই তবুও এ কথা সত্য যে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে হামলা করেছে ও করছে তারা অস্ত্র ও অর্থ সহযোগিতা পাচ্ছে আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো থেকেই। কারণ আজ দেশে দেশে পুঁজিবাদ ব্যর্থ, বিপর্যস্ত। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকার শ্রমিকের বিক্ষোভে উত্তাল গোটা ইউরোপ। গ্রীস দেউলিয়া হয়ে গেলো। আমেরিকায় ঘটে গেলো 'ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট'। এই ক্রমবর্ধমান বাজার সংকট মোকাবেলা করার উপায় কী? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের আপেক্ষিক *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রামপাল চুক্তি বাতিল ও সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে
জাতীয় কমিটির বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি হামলা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি বাধা

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সুন্দরবনবিনাশী ও দেশধ্বংসী সকল চুক্তি বাতিল এবং বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আহুত বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে। এ সময় পুলিশি হামলায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক শরিফুল চৌধুরী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার, অর্থ সম্পাদক প্রসেনজিৎ সরকার, ইডেন কলেজ শাখার সংগঠক লুবাইনা আন্নি, ঢাকা নগর শাখার সদস্য অরূপ দাশ শ্যাম, রহিম ফারায়েজি, আঁখি আক্তার, মাগফুরা জেরিন, ফারুক হাসানসহ জাতীয় কমিটির অর্ধশত নেতা-কর্মী আহত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ৬ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে সকাল ১১টায় প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি জাতীয় উদ্যান ও শিশু পার্কের সামনে দু দুটি ব্যারিকেড অতিক্রম করে শাহবাগ হয়ে পরীবাগ পৌঁছালে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে।

দেশের জাতীয় সম্পদ সুন্দরবন ধ্বংস করতে সরকার জনসাধারণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও সকল মতামত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ গায়ের জোরে ভারতের এনটিপিসি কোম্পানির সাথে চুক্তি করে রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহতা তুলে ধরে সারাদেশের মানুষের মধ্যে মতামত তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু মহাজোট সরকার কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে দেশের স্বার্থ সম্পূর্ণ জলাঞ্জলী দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় সদা তৎপর ভূমিকা পালন করছে। দেশের মধ্যে যেন কোনো ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে এই জন্য সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় এ সকল প্রতিবাদ কর্মসূচী দমন করছে।

সকালে প্রেসক্লাবের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ, বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সকলেই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) স্থায়িত্বও আর নেই। অর্থাৎ একসময় একটা সংকট থেকে আরেকটা সংকট আসার মধ্যবর্তী সময়ে যে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব পুঁজিবাদের থাকতো- এখন আর তা নেই। এখন বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট এবেলা ওবেলার সংকটে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আজকের যুগে দেশে দেশে পুঁজিবাদ বাঁচার জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ ধরেছে। এ ভিন্ন তার বাঁচার আর কোনো পথ নেই। অর্থাৎ সমস্ত শিল্প যখন মন্দায় ডুবছে তখন ব্যাপক পরিমাণে সামরিক শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। পুঁজিপতিরা অস্ত্র উৎপাদন করছে, রাষ্ট্র তা অর্ডার দিচ্ছে এবং নিজেই কিনছে। এতে সুবিধা হলো মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপর এ বাজারকে নির্ভরশীল থাকতে হয় না, উপরন্তু অস্ত্র কারখানা ও তাকে কেন্দ্র করে যে সহযোগী ব্যবসাসমূহ গড়ে উঠে তা দিয়ে অর্থনীতিতে একটি তেজিভাব আসে। কিন্তু এর আর এক দিক হলো এই অস্ত্র খালাস করার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন আংশিক ও স্থানীয় যুদ্ধ (Local and partial war) লাগিয়ে রাখতে হয়, নিজেকে তাতে যুক্ত হতে হয়, অপরকে যুক্ত করতে হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদ আজ দুনিয়াব্যাপী সংঘাত সংঘর্ষ ছড়িয়ে দিচ্ছে ও তাকে দীর্ঘস্থায়ী করছে।

এই আংশিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধ লাগানোর জন্য এখন সন্ত্রাসবাদ একটা বিরাট অস্ত্র। বিশ্বের যে কোনো দেশে সন্ত্রাসীদের কথা বলে আমেরিকা ঢুকে পড়ছে। টুইন টাওয়ারে হামলার পর 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' এর নামে আমেরিকা যত্রতত্র আক্রমণ করার লাইসেন্স পেয়েছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে ছাড়খার করে দিয়েছে। ২০০১ সালে আমেরিকা আক্রমণ চালিয়ে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত তালেবান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারজাই সরকারকে বসায়। তারপর ইরাক, তারও পরে লিবিয়া আক্রমণ করে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ঐ দেশগুলোর তেলক্ষেত্র দখল করে। বাস্তবে তেলক্ষেত্র দখল ও তার আধিপত্য রক্ষার জন্য ঐ সকল দেশের সরকারকে উৎখাত করা, সেসব দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করা- এসব কাজে সাম্রাজ্যবাদীরা এই গোষ্ঠীসমূহকে ব্যবহার করেছে। এ সকল ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো উগ্র সুন্নি ধারণার। আমেরিকা তাদের এই বিভেদকে উস্কে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট গোষ্ঠীগত দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। আজ সেখানে শিয়ার বিরুদ্ধে সুন্নি লড়ছে, সুন্নির বিরুদ্ধে কুর্দিরা লড়ছে, এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরেক গোষ্ঠী লড়ছে। রক্তের সাগর বয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে।

আর আমেরিকা? সে তাদের সবাইকে অস্ত্র বিক্রি করছে। যে আইএসের বিরুদ্ধে সে মহাযুদ্ধ ঘোষণা করে সারা দুনিয়ার মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের উপকার করছে এ ভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে সে নিজেই অস্ত্র বিক্রি করছে। তার ভুরি ভুরি প্রমাণ এখন পত্রপত্রিকায় আসছে। ইরাকি সেনারা কয়েকবার আইএস'এর জন্য অস্ত্র নিয়ে যাওয়া আমেরিকান বিমান গুলি করে নামিয়েছে। শুধু আমেরিকাই নয়, আইএস'এর কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা গেছে আইএস'এর বিস্ফোরকসমূহের কেমিক্যাল সরবরাহকারীদের খাতায় প্রায় সকল বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশের নাম আছে, এমনকি ভারতেরও।

বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিস্তার

বাংলাদেশে সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীবাদের বিস্তার নতুন কোনো ঘটনা নয়। আফগান যুদ্ধে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকে যাওয়া 'মুজাহিদরা' দেশে ফিরে ১৯৯২ সালে হরকত-উল-জিহাদ গঠন করে বলে জানা যায়। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী হামলা শুরু হয়। পরবর্তী কয়েকবছর রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে, সিপিবি-র জনসভায়, যশোরে উদীচী কার্যালয়ে, মাজার-সিনেমা হল-যাত্রা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্নস্থানে বোমা হামলায় অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এসব হামলার সুষ্ঠু তদন্ত-বিচার-হামলাকারীদের পরিচয় উদঘাটন করেনি, বরং এসব ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। জঙ্গীদের প্রশ্রয় দেয়া বা তাদের সাথে সরকারের কোনো কোনো মহলের যোগসাজশের অভিযোগ তখনো উঠেছিল। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহীর বাগমারায় সর্বহারা দমনের নামে বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে জেএমবিকে সরকারী মদদ দিয়ে একধরণের মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়া হয়। এমনকি সরকারের উচ্চ মহলের যোগসাজশে ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালাতে মুফতি হান্নানের নেতৃত্বে হরকত-উল-জিহাদের একটি গ্রুপকে সহযোগিতা করে প্রশাসন। ২০০৫ সালে জেএমবি ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কথিত জিহাদের ডাক দেয় এবং সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে শুরু করে। জঙ্গীরা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণে নামায় বাধ্য হয়ে সরকার তাদের দমনে তৎপর হয়। জেএমবি নেতাদের ফাঁসি, বহু জঙ্গী সদস্য গ্রেপ্তার, প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অভিযান ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধারের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তখনকার মতো অনেকটা স্তিমিত হয়।

কিন্তু, প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ হলেও গোপনে সদস্য সংগ্রহ ও খেলাফত রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন। এই সরকারের আমলে নতুন করে আলোচনায় আসে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ও হিজবুত তাহরীর। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে জামাত নেতাদের ফাঁসি ও শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ চলাকালীন সময়ে 'নাস্তিক' ইস্যুকে সামনে আনা হয়। হেফাজতে ইসলামী নামক যে সংগঠনটি 'নাস্তিক' ব্লগারদের তালিকা প্রকাশ করে ফাঁসিসহ নারীবিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল ১৩ দফা দাবি নিয়ে হাজির হয় সেই হেফাজতে ইসলামের সাথে মহাজোট সরকারের আপোষ ও দহরম-মহরম আমরা দেখেছি। এরপর থেকে নাস্তিক কতলের নামে ঘোষণা দিয়ে তালিকা ধরে ধারাবাহিক হত্যা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, লেখক-প্রকাশক-শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মীসহ উদারমনা ব্যক্তিবর্গকে হত্যার অভিযানে বিস্তৃত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকারই দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিস্তার ঘটিয়েছে

ওপরে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা দেখতে পাই, শাসকগোষ্ঠী সবসময় জঙ্গীবাদের সমস্যা নিজেদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে এবং সঠিক সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে একে প্রশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর যত শক্তি ক্ষমতায় এসেছে, শুরু থেকে আজ অবধি, তাদের সবাই ধর্মীয় শক্তির সাথে আপোষ করেছে। আন্দোলন ঠেকানোর জন্য, মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য তারা ধর্মীয় শক্তির প্রসার ঘটিয়েছে, তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। নিজেদের গণবিরোধী শাসন আড়াল করতে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দিয়েছে, কূপমণ্ডুক মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। আর ইতিহাস হলো এই যে, জনগণকে দমন করার জন্য বুর্জোয়ারা যাদের সৃষ্টি করেছে, যাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে- তারা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার পর নিজেরাই আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। এরা আন্তর্জাতিকভাবে যে সকল জঙ্গীরা আছে (তাদের সৃষ্টি কি করে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি) তাদের সাথেও সংযোগ স্থাপন করেছে। অথচ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র – যেখানে ধর্ম হবে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু তাকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায় না রেখে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হতে থাকলে তার মধ্যে উগ্রতা তৈরি হতে বাধ্য। কারণ রাষ্ট্র যদি কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করে তবে তার যে রাজনৈতিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক প্রভাব তৈরি হয়, সেটা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তগত করার স্পর্ধা না দেখিয়ে পারে না।

গোটা বিশ্বেই পুঁজিবাদ আজ ধর্মের সাথে আপোষ করে চলছে

সামন্ত স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানা- এসবকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা। সামন্ত সমাজের এ্যাবসলিউটিজমের বিপরীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি ইত্যাদি চিন্তাগুলো তারা সমাজে এনেছিলো। রাজারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে যে চিন্তা সামন্ত সমাজের মধ্যে ছিলো- তার বিরুদ্ধে লড়াই করে বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণ ইহজাগতিক, পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা সমাজে এনেছিলো। এই মানবতাবাদের মূল সুর ছিলো 'Non recognition of any spiritual entity'। সেই স্পিরিট তারা ততদিন পর্যন্তই টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলো যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিলো। সেই প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির উপরিকাঠামো হিসেবেই সেগুলো সমাজে বজায় ছিলো। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেহেতু একসময় সে অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে বিকাশের অমোঘ নিয়মেই একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হলো। ক্রমেই সে শিল্প পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিলো এবং সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হলো। এই একচেটিয়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাবিহীন অবস্থায় আগের সেই স্পিরিট ধরে রাখতে পারেনি এবং পারবেনা যে সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। ফলে পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে সৃষ্ট বৈষম্যের স্বরূপমানুষ যেনো বুঝতে না পারে সেজন্য আজকের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার তথা ধর্মের সাথে আপোষ করে পথ চলছে।

জাতীয় ঐক্যের কথা কারা তুলছেন, কেন তুলছেন?

গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনার পর দেশের মানুষ যখন ক্ষোভে ও শোকে মুহ্যমান, এই সুযোগে জনগণের কাছে পরম পরিত্যাজ্য আওয়ামী লীগ জাতীয় ঐক্যের শ্লোগান তুললেন। তাদের ফ্যাসিবাদী শাসনে গোটা দেশের মানুষের মধ্যে বিক্ষুব্ধতা জমে আছে, যা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে গণআন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি- এ সবকিছুকে এখন তারা একটি শব্দের নিচে চাপা দিতে চান। একই সময়ে বিএনপিও জাতীয় ঐক্যের কথা তুললেন, কারণ তা নাহলে এমনিতেই তারা গণবিচ্ছিন্ন, তাদের আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে তারা বলেছেন জামায়েতে ইসলামী'র কথা বলে ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রস্তাব বিএনপি মানবে না, বিএনপির প্রস্তাব আওয়ামী লীগ মানবে না- এই হবে জাতীয় ঐক্যের পরিণতি।

জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে এর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এসেছে সিপিবি-বাসদ এর পক্ষ থেকে। তারা সাম্প্রদায়িক শক্তি ব্যতিরেকে বাকি সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যের কথা বলেছেন। তাদের এই বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করেছে। বুর্জোয়ারা সংকটে পড়ে ঐক্যের কথা বলছে, তার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির কি কি ধরনের মিলন-বিচ্ছেদ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করছে – তাতে বামপন্থীদের কী? কার বিরুদ্ধে ঐক্য হবে, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তো? সারাদেশের মানুষইতো এর বিরুদ্ধে আছে। সরকার এর বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেবে। এদের সাংগঠনিক শক্তিকে মোকাবেলা করবে ও এদের গড়ে ওঠার যে ভাবগত জমিন এদেশে আছে, সরকার তার শোষণের প্রয়োজনেই যাকে জারি রেখেছে, সেটিরও মূলোৎপাটন করতে হবে। এই মর্মে মানুষকে জড়ো করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, তার প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী রাজনীতি জনগণের কাছে তুলে ধরাই না বামপন্থীদের কাজ। সরকার বলেছিলেন, দেশে আইএস নেই, জঙ্গী নেই। এখন সবাই বলছেন, আছে। জঙ্গীরা সরকারের নানারকম নিপীড়ন এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষের যে বিক্ষুব্ধতা – তার মধ্যেই আছে, সেই কারণেই আছে। তা নাহলে এদেশে তাদের থাকার প্রশ্ন উঠতো না। তাহলে আবার সরকারের সাথেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার দরকার কী?

দরকার আছে। সকল বামপন্থীরাই স্বীকার করেন, সমাজটা শ্রেণীবিভক্ত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সকল শ্রেণীর ঐক্য বলে কিছু থাকতে পারে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জাতীয় ঐক্যের মানেই হলো যত অন্যায়, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা সরকার করছে তাকে মানিয়ে নেয়ার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে তার পেছনে টেনে আনা। এই হলো দরকার। এই দরকারে সারা দিয়েছেন আমাদের তথাকথিত বিপ্লবী বামপন্থীরা। আর সারা দেয়াই শুধু নয়, এর প্রচারক হয়ে মাঠে নামা এই বামপন্থীদের ব্যাপারে জনগণ এখন থেকেই সচেতন না হলে ঠকবেন।

সিপিবির এসব ব্যাপারে ঐতিহ্য আছে। তারা '৭৪সালে নিজেদের দল বিলুপ্ত করে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। এবারও ঐক্যের ব্যাপারে কেউ ডাকুক না ডাকুক আমরা আছি এই দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। এবার তারা একা নন, তাদের বন্ধু হয়েছেন বাসদ। কিছুদিন আগেও এই দুই দল বুর্জোয়াদের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটে বড় দুই রাজনৈতিক দলের সাথে সওয়াল করেছেন – কী করে তা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটানো যায়। এভাবে বারবার তাদের সংকটকালে বুর্জোয়াদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে। এইরকম জাতীয় ঐক্যের কথা বলে বুর্জোয়ারা দেশে দেশে গণআন্দোলনসমূহকে নির্লজ্জভাবে দমন করে। এরা সবই জানেন। জেনেশুনেই বামপন্থী নাম নিয়ে এতবড় কেলেংকারি তারা করলেন, জনগণের প্রতি এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা তারা করলেন।

অপমানিত-অবমানিত দিশেহারা যুবকরাই গোটা পৃথিবীতে জঙ্গীদের মূল রিক্রুটমেন্ট

আমরা আগেই দেখিয়েছিলাম যে, সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে এই জঙ্গীদের সৃষ্টি করেছে, কেন আজও তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। তারা তাদের বিভিন্ন রকম চক্রান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই সন্ত্রাসী শক্তিসমূহকে কাজে লাগাচ্ছে। আবার এই সন্ত্রাসবাদীদের জঙ্গী মনন তারা তৈরি করছে বিশ্বব্যাপী তাদের লুণ্ঠন-আগ্রাসনের কারণে যে বিক্ষুব্ধতা যুবকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। বিশেষতঃ প্যালেস্টাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি দেশসমূহের উপর তারা যে জাতিগত ও ধর্মগত নিপীড়ণ চালিয়েছে- তা ভয়াবহ ও নির্মম। ঐ সকল দেশের অপমানিত-অবমানিত-দিশেহারা যুবকরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এ সকল সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের দেশেও পুঁজিবাদী শাসনে ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে নিষ্পেষিত হয়ে মর্যাদাহীনভাবে বেঁচে থাকা অপমানিত-অবমানিত-দিশেহারা যুবকরা এই পথে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই মনে করে তারা জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের প্রকৃত শক্তি - গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির দুর্বল অবস্থানের কারণে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াইয়ের পথ না পেয়ে এই অপমানিত-অবমানিত-দিশেহারা যুব সম্প্রদায় ক্রোধে-ঘৃণায় সাম্রাজ্যবাদীদেরই চক্রান্তের *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভারতের আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) মাধ্যমে গঙ্গা থেকে পানি নিয়ে যাওয়া হবে গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান ও তামিলনাড়ু এলাকায়। এতে গঙ্গায় যে পানি সঙ্কট হবে তা পূরণ করা হবে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দিয়ে। এভাবে মোট ১৭৪ বিলিয়ন কিউসেক পানি পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ, আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের শুরু হবে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে।

'মানস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা' সংযোগ পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে মানস-এর ওপর বাঁধ তৈরি করে সংযোগ খালের মাধ্যমে সংকোশ নদীর সাথে যুক্ত করা হবে। সেখান থেকে ব্যারেজ ও সংযোগ খালের মাধ্যমে পানি নিয়ে ফেলা হবে তিস্তা ব্যারেজের ওপরের অংশে। তিস্তা ব্যারেজে পানিপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করে মহানন্দা নদীর মাধ্যমে গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধের ওপরের অংশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আগেই অগ্রসর হয়েছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র বেসিনের উপনদী থেকে উদ্বৃত্ত পানি নিয়ে যাওয়া হবে গঙ্গায়। পরিকল্পনা অনুসারে গঙ্গার পানি সুবর্ণরেখা ও মহানদীর মাধ্যমে চলে যাবে ভারতের অন্য রাজ্যে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের অধীনে 'মানস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা' সংযোগ পঞ্চম আন্তঃরাজ্য প্রকল্প। প্রথম প্রকল্প মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কেন-বেতওয়া নদীসংযোগের চূড়ান্ত কাজ এবছরের শেষ নাগাদ শুরু হবে। আরো তিনটি প্রকল্প জরিপ-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর্ব শেষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২০০২ সালের ১৪ আগস্ট তৎকালীন বিজেপি সরকারের আমলে ভারতের রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে সংকটকালে দেশের নদীগুলোকে জুড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দেয়। ২০০২ সালের অক্টোবরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নদীসংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি নির্দেশনা জারি করে। ২০০৪ সালে দু'দেশে রাজনৈতিক দল, পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের মুখে ওই প্রকল্প বাস্ত বায়ন স্থগিত হয়ে পড়ে। ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নদীসংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে ভারত সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে এজন্য ১০০ কোটি রুপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছর জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ঢাকা সফরের সময় ৬৫ দফা সম্বলিত যে যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে ২১নং দফায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, ভারত আন্তঃ নদী সংযোগের ব্যাপারে এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়। ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রীর আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা উপরোক্ত অঙ্গীকারের পরিপন্থী। ভারত এভাবেই অতীতে ১৯৯৬ সালের ফারাক্কা চুক্তি, তিস্তা ও টিপাই বাঁধ নিয়ে প্রতিশ্রুতি কোনোটাই রক্ষা করেনি। আরো উল্লেখ্য, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শীর্ষ বৈঠকে যৌথ নদী বিষয়ে অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত হয়। তাই, ভারত ইচ্ছে করলেই একতরফাভাবে অভিন্ন নদীগুলোর ওপর আন্তঃ নদী সংযোগের প্রকল্প বা আন্তঃ নদী পানি সরানোর প্রকল্প (ইন্টার রিভার ওয়াটার ট্রান্সফার প্রজেক্ট) বাস্তবায়ন করতে পারে না।

দেশের প্রায় ৬০/৭০ ভাগ পানি ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই নদের পানি উজানে প্রত্যাহার হলে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। অথচ, মহাজোট সরকার তাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতের অন্যায়ভাবে একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরোধিতা করছে না। উল্টো ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং যাওয়ার স্বার্থে ভারতের শাসকশ্রেণীকে তোয়াজ করছে। দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ফেলে ভারতকে ট্রানজিট দিচ্ছে, বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে। অথচ, অভিন্ন নদী নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অনেক আলোচনা-চুক্তি-যৌথ ঘোষণা হলেও বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকারই ভারত তোষণ ও নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশ ও দেশের মানুষ বিপন্ন হলেও শাসক গোষ্ঠী থেকেছে নির্বিকার। ভারত সরকারের একতরফা পানি প্রত্যাহার ও বাংলাদেশ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তোলা আজ জনস্বার্থে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় কমিটির বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর) সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, সিপিবি'র রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের বজলুর রশীদ ফিরোজ প্রমুখ।

মিছিল শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত খোলা চিঠি পাঠ করে শোনান জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, যে ভারতীয় এনটিপিসি বাংলাদেশে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে চাচ্ছে, সেই ভারতেরই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের 'ইআইএ গাইড লাইন, ২০১০' এ স্পষ্ট বলা আছে- নগর, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা ইত্যাদির ২৫ কি.মি সীমার মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এড়িয়ে চলতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিলে সুন্দরবনের ঘাড়ে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে তা ভারতের আইনে অবৈধ। সেজন্য ভারতের সজাগ মানুষও ক্রমে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন।

১৪ কি.মি দূরত্বসীমা যে মোটেই নিরাপদ কোনো দূরত্ব সীমা নয়, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলেও স্পষ্ট বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের টেন্নেসের ফায়েত্তি কাউন্টিতে ১৯৭৯-৮০ সালে ১২৩০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময়ও স্থানীয় মানুষকে আশ্বস্ত করা হয়েছিলো। পেকান বৃক্ষগুলো (একধরনের শক্ত বাদাম, কাজু বাদামের মতো) যখন একে একে মরতে শুরু করলো ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের হিসেবে ফায়েত্তি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস বিশেষত সালফার ডাই অক্সাইডের বিষক্রিয়ায় পেকান, এলম, ওক সহ বিভিন্ন জাতের গাছ আক্রান্ত হয়েছে, বহু পেকান বাগান ধ্বংস হয়েছে এবং এই ক্ষতিকর প্রভাব কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এমনকি ৪৮ কিঃমিঃ দূরেও পৌঁছে গেছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। এই ফ্লাই অ্যাশ, বটম অ্যাশ, তরল ঘনীভূত ছাই বা স্লারি ইত্যাদি ব্যাপক মাত্রায় পরিবেশ দূষণ করে কারণ এতে আর্সেনিক ও বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, বেরিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম মিশে থাকে। এর ফলে সুন্দরবনের পশুপাখি বৃক্ষ লতাপাতাসহ অসংখ্য প্রাণ এবং ইকো সিস্টেম ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে। তাই অবিলম্বে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে জাতীয় কমিটির ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান এবং একই সাথে হামলায় জড়িত দায়ি পুলিশ সদস্যদের বিচার দাবি করেন। তিনি দেশের সচেতন জনসাধারণকে সুন্দরবন ধ্বংসসহ মহাজোট সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিশাল ব্যয়ের বোঝা ও ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ১০ হাজার বছর পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। বলা হচ্ছে রাশিয়া এই বর্জ্য বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরণের কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তি এখনও স্বাক্ষর হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে সুদূর রাশিয়ায় নিরাপদে এই বর্জ্য কিভাবে নিয়মিত পরিবহন করা হবে সে বিষয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দামও খুব কম হবে না। এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল চুক্তি সইয়ের পর জানানো হয়েছিল যে প্রতি ইউনিটের দাম পড়বে সাড়ে পাঁচ টাকা। আবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) হিসাবে রূপপুর কেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম সাড়ে সাত টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ফলে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিরাপদ তো নয়ই, সস্তাও নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস-কয়লা-পানি-বায়ু প্রভৃতি বিপুল প্রাকৃতিক উৎস আমাদের দেশে আছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করার আগে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে এই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যয়বহুল প্রকল্প কেন? এর পেছনে একদিকে আছে শাসকদলের বাহবা নেয়ার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বিশাল বাজেটের এই প্রকল্প থেকে হয়তো অনেকের পকেটে মোটা অংকের কমিশন জমা হবে। কিন্তু হুমকির মুখে পড়বে জনগণ আর ঋণের বোঝা চাপবে দেশের ঘাড়ে।

সকলেই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে

(২য় পৃষ্ঠার পর) ফাঁদে পড়ে আজ উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী পথে পা বাড়িয়েছে।

এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে সারা বিশ্বে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। এই ঘটনাগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকরা ভালভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন। দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা দেশসমূহেও আজ মত প্রকাশের অধিকার সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। ফ্রান্সে গত তিন মাস ধরে চলা জরুরি অবস্থা আরও বাড়ানো হয়েছে। ঐ দেশে চলতে থাকা রেলসহ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট দমন করা হয়েছে। দেশে দেশে এই ঘটনা এখন ঘটতেই থাকবে। রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রিয় জরুরি পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এসব দেশে গণআন্দোলনসমূহকে নির্মমভাবে দমন করা হবে। দেশের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী আবহ তৈরি করা হবে, ডাক দেয়া হবে জাতীয় ঐক্যের। জনগণকে দেখানো হবে এই মুহূর্তে মালিক-শ্রমিক বলে কিছু নেই- সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিপদ মোকাবেলা করতে হবে।

কিন্তু এ সময়ে মালিকরা এক টাকাও লাভ কমাবেন না। শ্রমিক শোষণ বন্ধ হবে না, বরং আরও দ্বিগুণ গতিতে চলবে। প্রতিবাদ করলে বলা হবে জাতীয় ঐক্যে চিড় ধরানো হচ্ছে, জঙ্গিবাদের হাত শক্তিশালী করা হচ্ছে। আমাদের দেশে গুলশান ও শোলাকিয়ার কাঁপুনি থামার আগেই সরকার রামপাল নিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলেছেন, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। এ সবই পুরনো কৌশল, চেনা ছক। কিন্তু বারবার মানুষকে তারা এভাবে ফাঁসিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সাম্রাজ্যবাদীরা আজ সারা বিশ্বে কি ভয়াবহ কাণ্ড করে চলেছে। সে সন্ত্রাসীদেরও সৃষ্টি করছে, তাকে অস্ত্রও দিচ্ছে – আবার তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে। এই জঙ্গীদের প্রতিশোধপ্রবণ মন সাম্রাজ্যবাদীরা তৈরি করছে তাদেরই শোষণ-অন্যায়-অত্যাচারের কারণে যে অপমান-অবমাননাবোধ তাকে কেন্দ্র করে, আবার একে তারা ব্যবহার করছে তাদেরই স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। দেশে দেশে তারা এক জাতির সাথে আরেক জাতির, এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের বিভেদ লাগিয়ে রাখছে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ লাগিয়ে দেশ ছাড়খার করে দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্র দখলের জন্য গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে কবরস্থানে পরিণত করেছে। শিয়া-সুন্নিদের একে অপরকে একবারে খতম করে ফেলার যুদ্ধ কী মুসলমানদের দরকার ছিলো? তাহলে দরকার কার ছিলো? কার ইঙ্গিতে নিজেরা খুনোখুনি করে পরস্পর নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে?

আজ বিশ্বব্যাপী এই সমস্ত নৃশংস জঙ্গি হামলার কারণে গোটা বিশ্বে অন্যান্য সমস্ত ধর্মাবলম্বী, সমস্ত জাতি, গোষ্ঠীর কাছ থেকে মুসলমানরা পৃথক হয়ে পড়ছে। মুসলমান মাত্রেই সন্ত্রাসী- এই চিন্তা মানুষের মধ্যে দৃঢ় হচ্ছে। সেটা আরও অপমান-অবমাননা তৈরি করছে। এ থেকে যদি দেশের তরুণরা-যুবকরা আরও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে তো এ জাতির নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। এত ক্রোধ, এত অপমানবোধ নিয়ে মহৎ কিছু দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

এই যুবকেরা নিজের প্রাণ ত্যাগ করতে দ্বিধা করছে না, তাদের আমরা ভেবে দেখার জন্য বলবো, যত অপমান, যত অবমাননা-শোষণ-লাঞ্ছনা আজ জগতে আছে – এর উৎস কী? কারা মানুষের সর্বস্ব হরণ করে তাকে পথের ভিখিরি করছে, কারা জাতিতে জাতিতে দাঙ্গা লাগাচ্ছে, একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা লাগাচ্ছে, দুনিয়াতে রক্তের সাগর বইয়ে দিয়ে কাদের লাভ হচ্ছে? এদের বাদ দিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে কোনো বড়ত্বই অর্জন হবে না। বরং প্রাণ তুচ্ছ করার মতো বিরাট ক্ষমতার অপব্যবহার হবে। তার ফল ভোগ করবে সেই তারাই যাদের প্রতি ক্ষোভ থেকে তারা এ রাস্তায় এসেছে।

তাই আজ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত লড়াই-ই একমাত্র এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শোষিত-নির্যাতিত মানুষকে তাদের সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এই সকল সংকটের উৎস পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একত্রিত হতে হবে। এছাড়া আর সকল পথ মিথ্যা, ধোঁকাবাজী ও লোক ঠকানোর পথ। এ লড়াই যারা করবে, সমাজের মানুষকে সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই যারা ভয়হীনচিত্তে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাদের মধ্য থেকেই একদিন চরিত্রের বড়ত্ব ও মহত্ব নিয়ে নতুন মানুষের জন্ম হবে।

ভারতের আন্তঃ নদীসংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ

প্রতিবাদে ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা- কুড়িগ্রাম রোডমার্চ

ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পাড়ের হাজার হাজার চাষী হাহাকার করছে। ফারাক্কার কারণে পদ্মা অববাহিকায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে। এককালের নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী আজ মৃতপ্রায়। ভারতের পানি আগ্রাসনে বাংলাদেশ যখন মরুভূমির দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন তা আরো ত্বরান্বিত করতে ভারত সরকার বিতর্কিত 'আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। গত ১৬ মে ২০১৬ ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতী বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ভারত আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। উমা ভারতী বলেন, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রধান নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে খরাপ্রবণ এলাকায় পানি পৌঁছানোই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কাজ। এ দু'টি নদীই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা (বাংলাদেশে পদ্মা) থেকে পানি সরিয়ে নিলে তার রেশ বাংলাদেশের ওপরে প্রবলভাবে পড়বে। কমে যাবে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও যমুনার পানি।

গত ২৫ জুলাই রংপুরে সংবাদ সম্মেলন থেকে রোডমার্চ কর্মসূচী ঘোষণা করছেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র নেতৃবন্দ

ভারত জুড়ে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের যে মহাপরিকল্পনা রয়েছে তারই অংশ হিসেবে 'মানস-সংকোষ-তিস্তা-গঙ্গা' নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে বলে ভারতের তৎকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রী সানোয়ার লাল জাট- এর বক্তব্য দিয়ে গত ১৩ জুলাই ২০১৫ ভারতের পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। দেশটির পানিসম্পদ মন্ত্রী সানোয়ার লাল জাট জানিয়েছেন – তার মন্ত্রণালয় আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী সংযোগ প্রকল্প 'মানস-সংকোষ-তিস্তা-গঙ্গা'র কাজ শুরু করবে। এ সময় পানিসম্পদ মন্ত্রী আরো বলেছেন, এ সংযোগ প্রকল্প শুধু এ অঞ্চলের কৃষি ও পানি প্রাপ্যতাকেই সহজ করে তুলবে না, একইসঙ্গে তা দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে বিশাল পরিমাণ পানি চালান করবে। মানস ও সংকোষ হল ব্রহ্মপুত্রের দু'টি উপনদী যার পানি সরিয়ে নেয়ার অর্থ হল ব্রহ্মপুত্রে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া। বাংলাদেশের মিঠা পানির তিন ভাগের দুই ভাগই আসে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। এমনিতেই চীন ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণের পাঁয়তারা করছে। তার ওপর এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

ভারত আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানি ও খাদ্যের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দেশের ছোটবড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেয় তার নাম আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প। এই ৩০টি নদীর মধ্যে ১৪টি নদী হিমালয়ান অঞ্চলের এবং ১৬টি পেনিনসুলার নদী। পরিকল্পনার মূল দিক হচ্ছে এক নদী বেসিন থেকে পানি অন্য নদী বেসিনে স্থানান্তর করা। বৃষ্টিপ্রধান উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে পানি খাল কেটে পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। সংযোগ খালের *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিশাল ব্যয়ের বোঝা ও ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশ

পাবনার রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষে গত ২৬ জুলাই রাশিয়ার সাথে ঋণচুক্তি করলো মহাজোট সরকার। সম্পূর্ণত রাশিয়ার ঋণ, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তার ওপর নির্ভর করে বিপুল ব্যয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে সচেতন মহলে বহুদিন ধরেই উদ্বেগ বিরাজ করছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে আপত্তি মূলত ৪টি কারণে। প্রথমত, এর বিপুল ব্যয় ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বারবার ব্যয়বৃদ্ধি। ২০০৯ সালে ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি ডলার বা ২৪ হাজার থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকার কথা বলা হলেও নির্মাণ শুরু হওয়ার আগেই কয়েক ধাপে ব্যয় বাড়িয়ে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার বা ১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ কোটি টাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই ব্যয় আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা সঠিকভাবে দরকষাকষি করতে না পারাতেই এই অতিরিক্ত ব্যয়। এখানেই আসে দ্বিতীয় আপত্তির কথা। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ-পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বা জনবল বাংলাদেশের নেই, তৃতীয় কোনো অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও দেয়া হয়নি। ফলে, সবকিছুর জন্য রাশিয়ান কোম্পানির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনা হলে প্রলয়ংকরী ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয় মানুষ ও পরিবেশের। চেরোনবিল, থ্রি মাইল আইল্যান্ড কিংবা সাম্প্রতিক ফুকুশিমা এর মত বড় বড় দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে প্রযুক্তির দিক দিয়ে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোতে, যারা নিজস্ব দক্ষতাকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছিল। কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণের ঝুঁকি থাকে। উচ্চ সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যা অনুসরণ করা প্রয়োজন তা বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হবে কি না সে বিষয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। চতুর্থত, বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত কাঁচামাল ইউরেনিয়াম থেকে *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গুলশান-শোলাকিয়ায় জঙ্গী হামলার প্রতিবাদে

বাম মোর্চার বিক্ষোভ

গুলশানে রেস্টুরেন্টে ও শোলাকিয়ায় বর্বরোচিত জঙ্গী হামলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণসহ সারাদেশে ধারাবাহিক উগ্রবাদী গুপ্তহত্যার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকে সারাদেশে 'বিক্ষোভ দিবস' পালনের অংশ হিসেবে গত ১৩ জুলাই বুধবার বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ (মাহবুব)-র কেন্দ্রীয় নেতা ইয়াসিন মিঞা ও মহিনউদ্দিন লিটন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া নিরপরাধ মানুষকে যারা জবাই করতে পারে, যারা ঈদের জামাতে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে, ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে নিরীহ পুরোহিত-ভিক্ষু-পাদ্রীকে কুপিয়ে খুন করে– তারা মানবতা ও সভ্যতার শত্রু। ধর্মের নামে মানুষ হত্যাকারী এই বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে আজ সোচ্চার হতে হবে।" তাঁরা বলেন, "সুরক্ষিত কূটনৈতিক এলাকায় বিপুল অস্ত্র-বোমাসহ সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ প্রমাণ করে দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও জনগণের নিরাপত্তাহীনতা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সরকার পুলিশকে দলীয়করণ করে বিরোধী দমনে ব্যস্ত। ধর্মের নামে গুপ্তহত্যাকে তারা সবসময় 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে দেখাতে চেয়েছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কাজে লাগাতে চেয়েছে। এই সুযোগে ধর্মীয় জঙ্গীবাদী শক্তি আজ মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। এখনো সরকার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষিদের চিহ্নিত না করে বিরোধীদের কাঁধে দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। জঙ্গী সন্দেহভাজনদের বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যার মাধ্যমে পুলিশি রাজত্ব কায়েম করছে।"

নেতৃবৃন্দ বলেন, "এদেশের শাসকগোষ্ঠী সবসময় নিজেদের গণবিরোধী শাসন আড়াল করতে এবং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দিয়েছে, ধর্মীয় কূপমণ্ডুক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছে। এর ফলে সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি-পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। মহাজোট সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন পাকাপোক্ত করতে পরিকল্পিতভাবে দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে। অধিকারহীন দমনমূলক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা হচ্ছে, অপরদিকে অন্ধকারের শক্তি মৌলবাদ-জঙ্গীবাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে।" নেতৃবৃন্দ মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ ও রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাবমুক্ত সকল বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-অসাম্প্রদায়িক শক্তি ও জনগণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ধর্মের নামে মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে ছাত্র ফ্রন্টের প্রতিবাদ মিছিল

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ১৮ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টুর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এদেশের শাসকগোষ্ঠী সবসময় নিজেদের গণবিরোধী শাসন আড়াল করতে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দিয়েছে, কূপমণ্ডুক মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজারি বিষয়গুলোই পড়ানো হচ্ছে, সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের বিষয়গুলোকে অবহেলা করা হয়েছে, কোনো ধরণের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা হয়নি। অথচ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। জঙ্গীবাদের সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে আজ তাই প্রয়োজন মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, সর্বোপরি গণতান্ত্রিক সমাজ-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান করা।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org । ই-মেইল : mail@spbm.org